ভারতীয় শহরগুলির পরিকল্পনার দায়িত্ব কার হাতে? ভারতের নগর পরিকল্পনা প্রণালীতে অসংগতি

ম্যাথিউ ইদিকুল্লা

২২ নভেম্বর, ২০২১

যখনই ভারতের শহরগুলি চেন্নাইতে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া নাগরিক বন্যার মত গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হয়, তখনই এই দেশের নগর পরিকল্পনার "এলোমেলো" অবস্থা অবধারিতভাবে গণবিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠে। যেহেতু, ভারতের "অব্যবস্থাপূর্ণ" শহরগুলির জন্য নগর পরিকল্পনা এবং তার প্রয়োগকেই নিয়মিতভাবে অভিযুক্ত করা হয়, তাই যে ভিত্তি ভারতের সাম্প্রতিক নগর পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে ঠেকা দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে তাকে পরীক্ষা করে দেখা অত্যন্ত প্রয়োজন। ভারতের নগর পরিকল্পনার সাংগঠনিক পরিকাঠামো নিয়ে কিছু মৌলিক প্রশ্ন আমাদের তুলে ধরতে হবেঃ নগর পরিকল্পনার দায়িত্ব কার হাতে? কেন ভারতের নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত আইন ও প্রণালী এইভাবে তৈরি হয়েছে?

ভারতের সাংবিধানিক নকশা অনুযায়ী, নগর পরিকল্পনা নির্বাচিত আঞ্চলিক সরকারের দায়িত্ব এবং ভারতীয় শহরের পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যকলাপ মূলত রাজ্য সরকারের অধীনস্থ অপ্রতিনিধিত্বমূলক বা নন-রিপ্রেজেন্টেটিভ আমলাতান্ত্রিক সংস্থার মাধ্যমে করানো হয়। এখানে আমি এই অসংগতির কারণ নিয়ে আলোচনা করতে চাই। ঔপনিবেশিক সময়ে শাসকদের নিজস্ব যুক্তি অনুযায়ী, নগর পরিকল্পনা ও "উন্নয়ন" থেকে নাগরিক রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হত। কি ভাবে এই বিচ্ছিন্ন করে রাখার বিষয়টি আজও ভারতের নগর পরিকল্পনা পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে চলেছে তা সামনে আনার জন্য আমি ভারতের নগর পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত সংগঠনগুলির ঐতিহাসিক ভিত্তি খুঁজে বের করব। এছাড়াও, ভারতের শহরগুলির জন্য এই রকম একটি সেকেলে পরিকল্পনা ব্যবস্থা অনুসরণ করার তাৎপর্যও আমি পরীক্ষা করে দেখব।

পরিকল্পনার অধিকার

১৯৯২ সালের সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে (তিয়াত্তর ও বাহাত্তরতম সংশোধন) ভারতের আঞ্চলিক শাসন পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে যার সাহায্যে গ্রামীণ ও নাগরিক আঞ্চলিক সরকারগুলিকে "স্বশাসিত সংগঠন" হিসাবে ক্ষমতা দেওয়া হয়। চুয়াত্তরতম সংশোধন অনুযায়ী নির্বাচিত পৌরসভাগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায় এবং দ্বাদশতম তপশীলের অধীনে যে বিষয়গুলি আছে সেগুলি সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও নকশা তৈরি ও প্রয়োগের অধিকার পায়। এই দ্বাদশতম তপশীলের তালিকার প্রথম তিনটি বিষয় হল নগর পরিকল্পনা, ভূমি ব্যবহারের নিয়মাবলী এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন। এছাড়াও চুয়াত্তরতম সংশোধনের নির্দেশ অনুযায়ী, ১০ লক্ষের উপর জনসংখ্যাসহ মহানগরগুলির জন্য একটি মহানগর পরিকল্পনা পরিষদ বা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং কমিটি (এমপিসি) নির্মাণ করতে হবে এবং এই কমিটির অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যকে নির্বাচিত আঞ্চলিক প্রশাসনের প্রতিনিধি হতে হবে। স্থানীয় সংগঠনগুলি যে পরিকল্পনা তৈরি করবেন সেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, মহানগরের এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনার দায়িত্ব এই কমিটির হাতে। অর্থাৎ, সংবিধান সংস্কার করে নির্বাচিত পৌরসভার হাতে নগর পরিকল্পনার কাজ দেওয়া হয়েছে এবং এর পাশাপাশি, বৃহত্তর অঞ্চলের পরিকল্পনা করার দায়িত্বে আছে এমপিসি।

কিন্তু, ভারতের অধিকাংশ প্রধান শহরেই, পৌর প্রশাসন বা এমপিসি-র বদলে, এই নগর পরিকল্পনার কাজ করে রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। এই ডেভেলপমেন্ট অথরিটিগুলি হল সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যারা পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং আবাসন প্রকল্পের

পাশাপাশি একটি শহরের নগর পরিকল্পনার জন্যও দায়ী। এগুলি আমলাতান্ত্রিক সংস্থা যেখানে কোনো স্থানীয় প্রতিনিধিত্ব থাকে না এবং স্থানীয় প্রশাসনের প্রতি এদের কোনো দায়বদ্ধতাও নেই। ডেলহি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা ব্যাঙ্গালোর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির মত সংস্থাগুলি "মহাপরিকল্পনা" বা "মাস্টার প্ল্যান" তৈরি করে যা প্রতি দশ থেকে কুড়ি বছর অন্তর শহরে জমির ব্যবহার ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করে।

পরিকল্পনাকারী সংস্থাগুলির ঔপনিবেশিক উদ্ভব

ভারতীয় নগর পরিকল্পনা আঞ্চলিক গণতন্ত্রের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার এই যে অসংগতি তার দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ১৮৯৬ সালে বম্বের বুবোনিক প্লেগ মহামারীর উত্তরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসন নানা পরিকল্পনা সংক্রান্ত সংস্থা ও আইনের প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই সংস্থা ও আইনের মধ্যে দিয়েই ভারতের বর্তমান নগর পরিকল্পনা প্রণালীর উদ্ভব হয়েছে। ব্রিটিশরা ভারতের যে শহরগুলি তৈরি করেছিল সেগুলি প্রায় প্রত্যেকটিই দুই ভাগে ভাগ করা থাকত, অর্থাৎ "দুর্গ" বা "ফোর্ট" অঞ্চলে থাকতেন ব্রিটিশরা আর "দেশীয়" বা "নেটিভ" অংশে থাকতেন ভারতীয়রা। প্লেগ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত ব্রিটিশরা প্রধানত তাঁদের সেনা ছাউনি আর অসামরিক অংশ, যেখানে তাঁরা নিজেরা থাকতেন – এই দুই অঞ্চল নিয়েই প্রধানত মাথা ঘামাতেন। যখন বম্বের জনসংখ্যার প্রায় ছয় শতাংশ প্লেগে মারা যান এবং ব্যবসাবাণিজ্য পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়, তখন ঔপনিবেশিক সরকার এই দ্বৈত শহরকে একটি সম্পূর্ণ একক হিসাবে দেখতে শুরু করে ও সেই ভাবে হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন অনুভব করে।

১৮৯৮ সালে বম্বে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয় যা পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ভারত জুড়ে নির্মিত আরো অনেক ট্রাস্টেরই পথিকৃৎ। এই ট্রাস্টের দায়িত্ব ছিল বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা করা, নতুন রাস্তা তৈরি, আবাসন নির্মাণ এবং রোগের ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করতে জনবহুল অঞ্চলের অতিরিক্ত জনসংখ্যা কমানো। ঔপনিবেশিক সরকারের মতে, "দেশীয়" অংশের জনবাহুল্য ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থাই প্লেগ ছড়ানর কারণ। তাই বস্তি ভাঙা ও সেগুলির উন্নয়নের জন্য এই ট্রাষ্টের হাতে "বিশিষ্ট এলাকা" বা "এমিনেন্ট ডোমেইন" ক্ষমতা দেওয়া হয়।

পরে কলকাতা, লখনৌ, কানপুর, এলাহাবাদ, দিল্লি আর ব্যাঙ্গালোরের মত অন্যান্য ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত শহরেও সিটি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮২ সালে ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড রিপনের ঘোষিত আঞ্চলিক স্বশাসন সংক্রান্ত প্রস্তাবের পর পৌরনিগমগুলি অংশত প্রতিনিধিস্থানীয় সংস্থা হয়ে উঠেছিল। এই পৌরনিগমের সমান্তরালে এবং স্বশাসিতভাবে ট্রাস্টগুলি কাজ করত। নির্বাচিত পৌরসভার কোনরকম হস্তক্ষেপ ছাড়াই যাতে ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র নগর পরিকল্পনার বিষয়টি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তা এই ধরনের ট্রাস্টের কাজকর্ম নিশ্চিত করেছিল। পরে যখন এই সিটি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বদলে ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে পরিণত হয়, তখন নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রণালীকে আঞ্চলিক রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার এই রীতি এক স্থায়ী উত্তর-ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার রেখে যায়।

বহু বছর ধরে ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এতটাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে তা আঞ্চলিক প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়ার সংবিধানের প্রচেষ্টাও এই আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার পরিকাঠাম্ যা রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে একেবারে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল, তাকে ভেঙে ফেলতে পারে নি। চুয়াত্তরতম সংশোধন চালু হওয়ার পরে প্রায় তিন দশক কেটে গেলেও, গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রণালী চালু করার জন্য নগর পরিকল্পনা পরিচালনা সংক্রান্ত আইনকানুন এবং উন্নয়নের দায়িত্ব থাকা কর্তৃপক্ষের মধ্যে খুব গুরুতর কোন বদল ঘটে নি। অধিকাংশ নগর পরিকল্পনা বিষয়ক রাষ্ট্রীয় আইন এখনও যুক্তসরকার প্রচলিত ১৯৬০ সালের মডেল টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং ল-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি যা নিজেই আবার ১৯৪৭ সালের ব্রিটিশ টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং অ্যাক্ট থেকে উদ্ভূত। এই আইনগুলির সুযোগ নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় এবং টপ-ডাউন বা ক্ষমতার প্রবাহ উপর থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়ে নিচের স্তরে পৌঁছায় এবং স্থানীয় প্রশাসনের থেকে বিচ্ছিন্ন এমন এক পরিকল্পনা প্রক্রিয়া তৈরি হয় যাতে জনগণের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা খুবই সামান্য।

মহাপরিকল্পনা নির্ভর কাজের পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

ভারতীয় শহরগুলি এখনও ব্রিটিশদের থেকে অনুপ্রাণিত একটি সেকেলে পরিকল্পনা প্রণালী অনুসরণ করছে, যখন এমনকি খোদ ইউনাইটেড কিংডমেও এই প্রণালীর মধ্যে আমূল পরিবর্তন এসেছে। অধিকাংশ দুনিয়া উন্নততর পরিকল্পনা প্রণালীর দিকে এগিয়ে গেলেও ভারতে আজও "মহাপরিকল্পনা" দিয়েই কাজ শুরু হয় যা, অন্তত তাত্ত্বিকভাবে হলেও, শহরের যেকোনো উন্নয়নকেই নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। তবে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা আইন অনুযায়ী, এই মহাপরিকল্পনা প্রধানত পরিকাঠামোগত হাতিয়ার যা দিয়ে জমির ব্যবহার এবং ইমারতগুলিকে নির্দিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং তার সঙ্গে পরিবহন ও পরিবেশের মত মুখ্য বিভাগগুলিকে যুক্ত করার দরকার হয় না। তবে, আজকাল কয়েকটি মহাপরিকল্পনা এই বিভাগগুলি অন্তর্ভুক্ত করলেও তা আইনত বাধ্যতামূলক নয়। তাই, এখনও একটি শহরকে আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং উৎপাদন নির্ভর অঞ্চলের মত নির্দিষ্ট কাজের সঙ্গে যুক্ত অংশে বিভাজন করার দিকেই এই পরিকল্পনাগুলি বেশি মনোযোগ দেয়।

এই রকম অনমনীয় স্থান বিভাজনের উপর ভিত্তি করে নিয়ন্ত্রণ করার উপর নির্ভরশীল পরিকল্পনা প্রণালীতে ভারতের নাগরিক বাস্তবতার প্রতিফলন খুবই কম। নগরের চারিত্রিক বৈশিষ্টই হল বৈচিত্রময় নাগরিক রূপ এবং এমন এক চলিষ্ণু পরিসর যা ঐতিহাসিকভাবে মিশ্র প্রকৃতির। ফলত, কাগজেকলমে পরিকল্পনার যে ছবি আঁকা হয় এবং ভারতের শহরগুলির বাস্তবের মাটিতে যা গড়ে ওঠে, সেই দুই-এর মধ্যে যে স্ববিরোধ দেখা যায় তা আশ্চর্যজনক কিছু নয়। পরিকল্পনা প্রণালীর মধ্যে যে "ব্যর্থতা" লুকিয়ে আছে তার অনিবার্যতার কারণেই এই পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নানা ব্যতিক্রমকে অনুমোদন দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি, এমন "নিয়মাবলী" জারি করা হয় যার সাহায্যে পরিকল্পনার নির্দেশ মানা না হলেও সে বিষয়টিকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকে। তাই, যে আধুনিক ও যুক্তিপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণালীকে ভারতের শহরগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা আসলে শূন্যগর্ভ এবং তার কারণ অক্ষমতা নয়, বরং ইচ্ছাকৃত।

ম্যাথিউ ইদিকুল্লা আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ পলিসি অ্যান্ড গভর্নেন্সের ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি এবং ব্যাঙ্গালোরের নগর সংক্রান্ত সমস্যার আইন ও নীতির বিষয়ে স্বাধীন পরামর্শদাতা।